উপসংহার

২০০১ সালের জুন মাসে ইন্টারনেটে আবির্ভাবের পর থেকেই বহু চিন্তা জাগানো লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের মুক্তমনা সাইটটি। তার থেকে বাছাই করা কিছু প্রবন্ধ নিয়ে '*বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?*' বইটি সংকলিত করা হয়েছে। এর বাইরেও আলাদা করে বইটির জন্য লেখকদের কাছ থেকে লেখা আহবান করা হয়েছিল ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে। লেখা আহবানের পর অনেক লেখকদের কাছ থেকে খুব উৎসাহব্যাঞ্জক সারা পাওয়া গেছে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া বহু সুচিন্তিত লেখায় ধন্য হয়েছে আমাদের এই সংকলনটি। আমি এই সংকলনের সকল লেখকদের ধন্যবাদ জানাই।

এই সংকলনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা, জানা এবং বোঝার একটি চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, বিজ্ঞান এবং ধর্ম – দুটোর প্রভাব এবং গুরুত্ব আমাদের জীবন এবং সংস্কৃতিতে অপরিসীম। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কেমন? এ গ্রন্থের লেখকেরা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক গবেষণালব্ধ সাক্ষ্য-প্রমানের সাপেক্ষে এটি অনুসন্ধান করেছেন। তিনভাবে এদের মধ্যকার সম্পর্ককে দেখা যেতে পারে। এক – বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোনই দ্বন্দ্ব নেই। এক সর্বজ্ঞ স্রষ্টার ইচ্ছেতে তৈরী হয়েছে আমাদের এই বিশ্বজগৎ, আর তারই নির্দেশে সব কিছু চলছে। এই মতের অনুসারীরা মনে করেন, বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিস্কারগুলোর ইঙ্গিত স্রষ্টা আগে থেকেই ধর্মগ্রন্থগুলোতে দিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞানীদের কাজ কেবল সেগুলো খুঁজে বের করা। এই মতাদর্শের দাবীদারেরা বিশ্বব্রহ্মান্ডকে দেখেন অনেকটা ঘড়ির মত করে। বিজ্ঞানীরা কেবল চোখের সামনে এই ঘড়িটিকে দেখতে পান, এর অন্তর্নিহিত কলকব্জার চাল-চলনকে প্রত্যক্ষ করেন আর চালচলনের সূত্রগুলো উদ্ঘাটন করেন, কিন্তু কখনোই কারিগরের সন্ধান পান না। এদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা আব্দুর রহমান বয়াতীর গানের মত ... 'মন আমার দেহ-ঘড়ি, সন্ধান করি ... কোন্ মিস্তরী বানায়েছে ...'।

দ্বিতীয় মতাদর্শের অনুসারীরা মনে করেন, বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং তা খুব স্পষ্ট। এদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে এই দলের সমর্থকেরা অর্থহীন এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেন। এই মতের দাবীরারেরা মনে করেন, ধর্মের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং অভিমতকে বিজ্ঞান যুগে যুগে ভুল প্রমাণ করেছে বহুবার। এর মধ্যে পৃথিবীর বয়সের ভ্রান্ত অনুমান, ভু-কেন্দ্রিক তত্ত্ব, আত্মার অনুমান, সৃষ্টিতত্ত্বের নানা কেচ্ছা-কাহিনীসহ অনেক কিছুই আছে। এ বিপুল মহাবিশ্বকে ঘড়ির সাথে তুলনা করাকে তাঁরা অতি সরলীকরণ এবং ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই কোন কারিগর ছাড়া মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে আজ ব্যাখ্যা করতে পারে। মহাবিশ্বের কারিগরের ধারণাকে তারা দার্শনিকভাবেও ভ্রান্ত বলে তারা মনে করেন, কারণ সব কিছুর পেছনে একজন কারিগর থাকলে, সেই কারিগর কোত্থেকে উদ্ভুত হল সেটাও তো বলতে হবে। তারা আরো মনে করেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে কোন আধুনিক বিজ্ঞান নেই, বরং আছে আধুনিক বিজ্ঞানের নামে চতুর ব্যাখ্যা এবং গোঁজামিল। সেজন্যই, ধর্মের কাছে বিজ্ঞানের কখনো দারস্থ হতে হয় না, বরং ধর্মবাদীরাই আজ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের পর নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে

দিতে মুখিয়ে থাকে। কারণ ধর্মবাদীরা জেনে গেছে, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান ঠিকই টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া ধর্মগুলো বেঁচে থাকার আর কোন অক্সিজেন খুঁজে পাচ্ছে না।

তৃতীয় আরেকটি মত আছে। এই মতাদর্শের অনুসারীরা মনে করেন বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান আলাদা দুটি বলয়ে। এদের মতে, বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সূত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক জগতকে ব্যাখ্যা করে, আর ধর্ম নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের চর্চা করে। সহজ কথায় বিজ্ঞানের কাজ-কর্ম যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য যা আমাদের যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানকে প্রতিনিয়ত ত্বরান্বিত করে; আর ধর্মের কাজ মানুষের আত্মিক উন্নতিসাধন। যতক্ষণ বিজ্ঞান এবং ধর্ম পরস্পর আলাদা থেকে ভিন্ন ভিন্ন বলয়ে অবস্থান করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। ঝামেলা লাগে তখনই যখন এই দুই ভিন্ন বলয়ের অধিবাসীরা একে অপরকে অতিক্রম করতে চায়। যেমন, বিজ্ঞানীরা যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 'আত্মার ওজন' পরিমাপ করতে যান, কিংবা ধর্মবাদীরা যখন 'সৃষ্টিতত্ত্ব'কে কিংবা 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'কে বিজ্ঞানের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান ইত্যাদি। এই দলের সদস্যরা মনে করেন, বিজ্ঞান এবং ধর্মকে আলাদা বলয়ে আটকে রাখতে পারলেই তাদের মধ্যে সংঘাত এড়ানো সম্ভব।

এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে-বিপক্ষে বহু প্রবন্ধ এই বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও এসেছে নানা ধরনের বৈচিত্রময় বিষয়ানুগ রচনা। বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে? কিংবা মহাবিস্ফোরণ, সূক্ষ-সমন্বয় কিংবা নৃতাত্ত্বিক যুক্তগুলো কি স্রষ্টা থাকার আদৌ কোন যৌক্তিক প্রমাণ? এ সংকলনের সংশয়বাদী লেখকদের অধিকাংশই এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিপরীতে রায় দিয়েছেন। প্রায়শঃই বলা হয়, এক মহারহস্যময় 'অদ্বৈত বিন্দু' থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু এই বিস্ফোরণ কেন হয়েছে বা এই বিস্ফোরণের আগে কি ছিল – বিজ্ঞান নাকি এগুলো প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম - এ কথা বলেই বিস্ফোরণের পেছনে এক স্রষ্টা থাকার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হয়। বলা হয়, সব কিছুর পেছনে স্রষ্টা আছে, কাজেই মহাবিশ্বের পেছনেও একজন স্রষ্টা আছেন। সবকিছুর পেছনে স্রষ্টা থাকলে ঈশ্বরের পেছনে কেন কোন স্রষ্টা থাকবে না ব্যাপারটি অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। অবশ্য বিশ্বাসীদের মতে, এই ধরণের প্রশ্ন ভ্রান্ত। এই প্রশ্ন যদি ভ্রান্তই হয়, তবে মহাবিশ্বের পেছনে একটি মাত্র কারণের সন্ধান করা এবং কারণটিকে 'অপার্থিব লেবেল' এঁটে দিয়ে একে ঈশ্বর বানানো কতটা অভ্রান্ত? কিভাবে বোঝা গেল, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে কোন কারণ থেকে থাকলে সেটা কখনোই প্রাকৃতিক কারণ হতে পারবে না, ঈশ্বর নামক এক পরাক্রমশালী 'সত্ত্বাই' হতে হবে? আর এধরনের সত্ত্বা থেকে থাকলে তিনি কি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন? প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার কোন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ কি কোথাও আছে? আর মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছাড়া যদি কিছুই ঘটবার উপায় না থাকে তাহলে পাপপুণ্যের সকল দায়ভার কেন মানুষকেই বহন করতে হবে কেন, এটিও সমান যৌক্তিক প্রশ্ন – যা প্রতিটি যুগের চিন্তাশীল দার্শনিকেরা করে এসেছেন। সর্বজ্ঞ স্রষ্টার ইচ্ছেতেই যদি জগৎ তৈরি হয়ে থাকে, তা হলে দুর্ভিক্ষ, খরা, মহামারী, সুনামী, বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানির দায়-দায়িত্ব ঈশ্বর নেবেন না কেন? নিজের সৃষ্টি নিয়ে এধরনের 'ছেলে খেলা' - এই যে লক্ষ কোটি মানুষের মৃত্যু কিংবা ইতিহাসের পরিক্রমায় কোটি কোটি (কারো কারো মতে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ) প্রজাতির বিলুপ্তি কতটা তাঁর সৃষ্টির 'সূক্ষ সমন্বয়' (Fine Tuning) কিংবা 'বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার'

(Intelligent Design) দিকে নির্দেশ করে? এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করা ছাড়াও এ গ্রন্থে এসেছে মহাবিশ্ব, পরিকল্পনা বা ডিজাইন নিয়ে আলোচনা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মৌলবাদ প্রসঙ্গ, ধর্মের উৎস এবং অলৌকিকতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ধর্ম নারী এবং সমকামিতা প্রসঙ্গ, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ, যুক্তিবাদ, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা নিয়ে নানা ধরনের তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোকে মহাবিশ্ব এবং জীবনের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা হয়েছে, নির্দেশ করা হয়েছে আধুনিকতম দার্শনিক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যাগুলোর প্রতিও। নৈতিকতা জিনিসটা পরম নাকি আপেক্ষিক, কিংবা ধর্মই কি নৈতিকতার একমাত্র উৎস, কিংবা সমাজে গড়ে ওঠা মূল্যবোধগুলো সব ঈশ্বর প্রদত্ত কিনা – এ ব্যাপারগুলোও আলোচিত হয়েছে সুবিস্তৃত পরিমন্ডলে। আমাদের জানা মতে বাংলা ভাষায় এ ধরণের চিন্তার উদ্রেগকারী গ্রন্থ এই প্রথম। বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মুক্তমনে গ্রন্থটি পাঠ করার অনুরোধ রইলো।